সম্পাদকীয়

(https://bonikbarta.net/home/news_category/11/0)

শিল্প-গবেষণায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের নির্লিপ্ততা

আবু তাহের খান

বণিক বার্তা

অক্টোবর ২৪, ২০২৩ |

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতা সংস্থার (অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-ওইসিডি) প্রতিবেদনের তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে গত ১৭ সেপ্টেম্বরের বণিক বার্তায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তারা তাদের পণ্যের বহুমুখীকরণ, মানোন্নয়ন বা নতুন পণ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক কাজের ব্যাপারে একেবারেই নির্লিপ্ত। বিশ্বব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে ওইসিডি কর্তৃক প্রণীত 'উৎপাদন রূপান্তর নীতি পর্যালোচনা' (প্রডাকশন ট্রান্সফরমেশন পলিসি রিভিউ-পিটিপিআর) শীর্ষক ওই প্রতিবেদনের তথ্য থেকে দেখা যায়, নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবদান প্রায় শূন্যের কোটায়। আর বাংলাদেশের শিল্প ও সেবা খাত যেহেতু মূলত বেসরকারি খাতনির্ভর, সেহেতু বণিক বার্তার ওই প্রতিবেদনে এ অনাগ্রহ ও নির্লিপ্ততাকে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রধানত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দায় হিসেবে দেখা হয়েছে। অবশ্য তাদের এ

(https://electromart.com.bd)

দেখার মধ্যে মোটেও কোনো ভুল নেই, তবে অসম্পূর্ণতা রয়েছে এবং সেটি এই যে এ জাতীয় গবেষণা ও উদ্ভাবনের (আরঅ্যান্ডডি) প্রয়োজনীয়তা মূলত বেসরকারি খাতের হলেও এ কাজের জন্য বাংলাদেশে একাধিক রাষ্ট্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে, যাদের ভূমিকা বেসরকারি খাতের মতোই সমান হতাশাব্যঞ্জক। অতএব, এক্ষেত্রে উল্লিখিত উভয় খাতের ভূমিকা নিয়েই এখানে খানিকটা আলোকপাতের চেষ্টা করা হলো।

নতুন পণ্য ও সেবা উদ্ভাবন এবং ক্রেতা ও ভোক্তার রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের নকশা পরিবর্তন, গুণগত মানের উন্নয়ন ও এসবের বহুমুখীকরণ আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বাণিজ্য ও অর্থনীতির চলমান বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এগুলোর নিয়মিত চর্চা ও বাস্তবায়ন শুধু জরুরিই নয়, এসবের অনুপস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বড় ধরনের হুমকিও তৈরি করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বেসরকারি খাত আপাতভাবে বিষয়টি নিয়ে সেভাবে ভাবছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং তাদের ভাবনায় সম্ভবত কাজ করছে এ বোধ যে গবেষণা ও উদ্ভাবনের পেছনে অর্থ ব্যয় না করে তা যদি চলতি উৎপাদনের কাজে ব্যয় করা যায়, তাহলে সেটি তাদের জন্য অধিকতর মুনাফা অর্জনে সহায়ক হবে। তাছাড়া এটাও লক্ষণীয় যে গবেষণা ও উদ্ভাবনের পেছনে অর্থ ব্যয় না করলেও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না বা কাজটি মোটামুটি ভালোভাবেই চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক কাজ থেকে যে ধরনের ফলাফল আশা করা হয়, সেটি যদি কোনো গবেষণা ছাড়া এমনিতেই মিলে যায়, তাহলে আর কষ্ট ও ব্যয় বাড়িয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন কি?

বস্তুত সে রকম একটি অবস্থাই এখন দেশে বিরাজ করছে। নিম্ন ক্রয়ক্ষমতার এ দেশে ক্রেতা ও ভোক্তা উভয়েই বাজারে মোটামুটি মানের পণ্য পেয়েই খুশি।অতীতে দীর্ঘকাল ধরে অতি নিম্নমানের পণ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত এ ক্রেতারা অতিসামান্যতেই এতটা তুষ্ট যে চলতি ধারার গুণগত মানেই তারা রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। বিশ্ববাজারের উন্নত মানের পণ্যের সঙ্গে তাদের অধিকাংশেরই তেমন একটা পরিচয় নেই বিধায় তারা হাতের কাছে যা পাচ্ছেন, অতীতের মান বিবেচনায় সেটাকেই মহার্ঘ্য ভেবে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন।আর সেটাকেই সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে আমাদের উৎপাদকরাও এসব পণ্য থেকে বলতে গেলে অনেকটা একচেটিয়া মুনাফাই লুটছেন। আর দেশে যেহেতু এসব পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা চালু নেই, সেহেতু এ একচেটিয়াত্ব মেনে নেয়া ছাড়া ক্রেতার হাতে বিকল্প কোনো উপায়ও নেই।আর এরূপ একচেটিয়াত্বপূর্ণ মুনাফাসহায়ক পরিস্থিতিতে পণ্য বা সেবা নিয়ে উৎপাদকরা কেনই-বা গবেষণায় আগ্রহী হবেন? তারা তা হচ্ছেনও না।

প্রায় একই কথা প্রযোজ্য পণ্য রফতানি বা আমদানির ক্ষেত্রেও।অতি নিম্ন মজুরিতে উৎপন্ন পণ্যের গায়ে বিশ্বখ্যাত নামিদামি কোম্পানির লোগো বসিয়ে দিয়ে পণ্য রফতানির মাধ্যমে যেহেতু আয়-উপার্জন মোটামুটি ভালোই হচ্ছে, সেহেতু নিজেদের পণ্যের স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড বা পরিচিতি গড়ে ওঠল

(https://electromart.com.bd)

কিনা তা নিয়ে তাদের মোটেও কোনো মাথাব্যথা নেই। বরং নিজেদের উৎপাদিত পণ্যে তারা যে নামিদামি ব্র্যান্ডের লোগো এঁকে দিতে পারছেন, এতেই তারা খুশিতে আটখানা। কিন্তু তারা একবারের জন্যও ভেবে দেখছেন না যে ডেনিম, ওয়েব জিন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যদি বাংলাদেশে উৎপাদিত পোশাকের গায়ে নিজেদের লোগো বসিয়ে তা বাজারজাত করতে পারে, তাহলে ওই পোশাকের বাংলাদেশি মূল উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কেন নিজেরাই ব্র্যান্ড গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছেন না? এটি বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার দৈন্যই শুধু নয়, দীর্ঘকাল ধরে একটি আমদানিনির্ভর অর্থনীতির মধ্যে বসবাস করতে করতে আন্তর্জাতিক বাজারে যে নিজেদের কোনো স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড থাকতে পারে এ সাহসটুকু পোষণ করতেও ভয় পাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে বিনয়ের সঙ্গে বলি—এতটা ভীতি ও হীনম্মন্যতায় ভোগা একেবারেই অনুচিত। আর সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজটি করতে হলে এক্ষেত্রে সবার আগে প্রয়োজন হচ্ছে এসব পণ্যের উৎপাদন, বিপণন ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে নিরন্তর গবেষণা।

বাংলাদেশ বিদেশ থেকে যেসব পণ্য আমদানি করে তার মধ্যে নামিদামি ব্র্যান্ডের বিভিন্ন উন্নত মানের পণ্য যেমনি রয়েছে, তেমনি রয়েছে নানা জাতের অসংখ্য মানহীন পণ্যও। ওইসব মানহীন পণ্যের বিপরীতে তো বটেই, এমনকি উল্লিখিত মানসম্পন্ন ব্র্যান্ড পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার সামর্থ্যও বাংলাদেশের রয়েছে। কিন্তু কিছুটা হলেও হতাশাব্যঞ্জক ঘটনা এই যে নামিদামি ওই ব্র্যান্ড পণ্যগুলো বাংলাদেশের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য ও মুনাফা করে গেলেও তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজেদের ব্র্যান্ডকে খ্যাতিমান ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলার তেমন কোনো উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাই আমাদের উদ্যোক্তাদের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে না। আর এ ব্যাপারে তাদের তেমন কোনো আগ্রহ না থাকার কারণেই বস্তুত পণ্য নিয়ে তাদের তেমন কোনো গবেষণাও নেই এবং সে ধরনের গবেষণার প্রয়োজন তারা বোধ করছেন বলেও মনে হয় না।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে মোটামুটি বোঝা গেল যে পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাত কোনোটি নিয়েই গবেষণা পরিচালনা বা এ কাজে বিনিয়োগের তেমন কোনো আগ্রহ এ দেশের বেসরকারি উৎপাদকদের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে এবং এ না থাকার কারণগুলো সম্পর্কেও ওপরের আলোচনা থেকে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া গেল।কিন্তু রাষ্ট্র খাতের যেসব প্রতিষ্ঠানের ওপর এ জাতীয় গবেষণার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, তারা কী করছে? ১৯৭৩ সালে স্থাপিত বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) গত ৫০ বছরে শিল্প খাতের উন্নয়নে এমন কী কী গবেষণামূলক কাজ করেছে, যেটি দেশের সাধারণ শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য কাজে এসেছে? তারা এমন কী উদ্ভাবন করেছে, যেটি সাধারণ মানুষ জানে, যেমন করে সাধারণ মানুষ জানে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত নানা জাতের ধানের উচ্চফলনশীল বীজের কথা কিংবা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত নানাজাতের ফসলের কথা?

(https://electromart.com.bd)

দেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল যখন ছিল পাট, তখন পাটকাঠি থেকে কাগজ উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বিসিএসআইআর প্রথম আলোচনায় এসেছিল। কিন্তু এর পরবর্তী পাঁচ দশকে স্পিরুলিনা নামক সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে বিস্কুট উৎপাদনের মতো দু-একটি অতি সাদামাটা প্রাযুক্তিক উদ্ভাবন ব্যতীত এ প্রতিষ্ঠানের অবদান সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। অথচ বাংলাদেশের শিল্প-গবেষণার ক্ষেত্রে এটি এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারত। এ বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করা হলে, অনুমান করি, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তারা বলবেন যে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ না থাকা ও জনবলস্বল্পতাই এর মূল কারণ। কিন্তু সুনির্দিষ্ট ও মৌলিক গবেষণাকাজের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়ে তা পাওয়া যায়নি, এরূপ ঘটনা কখনো ঘটেছে বলে কি তারা উদ্ধৃত করতে পারবেন? বিসিএসআইআরের ওয়েবসাইটে ১৯৬৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত সময়ে তাদের উদ্ভাবিত ১ হাজার ১২টি শিল্পপণ্যের নাম রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে অতি মামুলি পণ্যের সংখ্যাই অধিক এবং এর চেয়ে ভালো মানের পণ্য বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা নিজেরাই উৎপাদন করতে পারেন। তাহলে যে আশা ও লক্ষ্য নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল, সেটি কি তাহলে শুধু কাগজে-কলমেই থেকে যাবে?

স্বীকার্য যে গবেষণামূলক কাজে অর্থ বরাদ্দ দেয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তপ্রণেতাদের মধ্যে ব্যাপক অনীহা ও বোঝাপড়ার ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি আবার এটাও সত্য যে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে মৌলিক গবেষণার ব্যাপারে শিল্প-গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোয় উদ্যম ও চিন্তাভাবনারও ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। কৃষি খাত নিয়ে বিআরআরআই বা বিএআরআইর যেসব প্রমাণিত উদ্ভাবনা রয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে তুলনাযোগ্য দু-চারটি উদ্ভাবনা কাজের উদাহরণ কি শিল্প-গবেণার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোয় রয়েছে? মোটেও না।

দেশের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানকে ইদানীং বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ মর্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে দেখা যাচ্ছে যে তাদের উৎপাদিত ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রিক্যাল পণ্য বিদ্যুৎসাশ্রয়ী, কেউ কেউ বলছেন তাদের পণ্য পরিবেশবান্ধব, কেউ কেউ তা স্বাস্থ্যসম্মত কিংবা স্বাস্থ্যের জন্য অক্ষতিকর বলে দাবি করছেন। এসব দাবি বা বক্তব্য সত্য হয়ে থাকলে তা নিঃসন্দেহে ওই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোর সীমিত গবেষণারই ফলাফল। কিন্তু বিভিন্ন শিল্পপণ্যের এরূপ বা এর চেয়েও উচ্চতর উপযোগসংক্রান্ত গুণাবলি বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় শিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কি আজ পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ বা কার্যক্রম হাতে নিতে দেখা গেছে?

পাট নিয়ে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) আজ পর্যন্ত যা যা করেছে, তা মূলত পাটের উৎপাদন উন্নয়নবিষয়ক অর্থাৎ কৃষি গবেষণাসংক্রান্ত কাজ এবং সেক্ষেত্রেও তাদের অবদান আহামরি তেমন কিছু নয়। পাট চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উর্বরতা গুণের বিবেচনায় বাংলাদেশের মাটি চীন ও ভারতের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে। অথচ চীন ও ভারতে পাটের হেক্টরপ্রতি উৎপাদন যেখানে যথাক্রমে ৩৬ হাজার ৮৯৭ হেক্টোগ্রাম ও ২৫ হাজার ৫৩৬ হেক্টোগ্রাম, সেখানে বাংলাদেশে এ উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ২১ হাজার ২৮৩ হেক্টোগ্রাম। সেক্ষেত্রে এখন

(https://electromart.com.bd)

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিজেআরআই গত ৭২ বছরে তাহলে করলটা কী? আর পাটভিত্তিক শিল্প-গবেষণায় প্রতিষ্ঠানটির তো কোনো ছায়াও চোখে পড়ছে না। অথচ রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে কি বিশাল স্থাপনা নিয়ে রাজাধিরাজের মতোই না এর অবস্থান!

অন্যদিকে পণ্যের মানোন্নয়নসংক্রান্ত গবেষণার কথা বলি।বিএসটিআই (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট) একটি নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠান এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যও অত্যন্ত সীমিত। ফলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণমূলক কাজগুলোই যেখানে তারা ঠিকমতো করতে পারছে না, সেখানে তাদেরকে গবেষণার কথা বলা আপাতদৃষ্টে খুবই বেমানান ও অন্যায্য বলে মনে হবে।কিন্তু তার পরও বলি, পণ্যের গুণগত মান যাতে এর উৎপাদকরা সংরক্ষণ করতে পারেন বা এর উন্নয়ন ঘটাতে পারেন, সেজন্য তাদের (বিএসটিআই) পক্ষেও কিছু গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেয়া সম্ভব বলে মনে করি।আর আমাদের অনেকে হয়তো জানিই না যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক মান সংস্থার (সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন-এসএআরএসও) সদর দপ্তর এখন ঢাকায় অবস্থিত। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসএআরএসওর সঙ্গে মিলে বিএসটিআই এ জাতীয় গবেষণার কাজ হাতে নিতে পারে বলে মনে করি।

এভাবে নানা উদাহরণ যুক্ত করে এ আলোচনাকে আরো দীর্ঘ করা যায় এবং বিষয়টির গভীরতা উপলব্ধি করার জন্য কখনো কখনো সেটি দরকারিও।কিন্তু কথা হচ্ছে, তাতে করে দেশের রাষ্ট্র খাতের শিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর ঘুম ঘুম মেজাজ ও আচরণের ক্ষেত্রে কি আদৌ কোনো পরিবর্তন আসবে? যদি তা না আসে, তাহলে ওইসিডির প্রতিবেদনে–যে বাংলাদেশের শিল্প খাতে নয়া পণ্য উদ্ভাবন, পণ্যের বহুমুখীকরণ, গুণগত মানোন্নয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে গবেষণামূলক উদ্যোগ ও অবদান প্রায় শূন্যের কোটায় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, দেশ কি তাহলে সেখানটিতেই থেকে যাবে? দেশের শিল্প খাতসংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি উদ্যোক্তা উভয়েরই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত বলে মনে করি।

আবু তাহের খান: ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত

সাবেক পরিচালক, বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়

সম্পাদকীয়

(https://electromart.com.bd)

অভিমত

বরফরাজ্যে বসন্ত এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

ওবায়দুল্লাহ সনি

অক্টোবর ২৫, ২০২৩

পৃথিবী পৃষ্ঠের স্থলভাগের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রায় ৩০০ থেকে ২০০ মিলিয়ন বছর আগে। বিজ্ঞানীদের দাবি, ওই সময় আফ্রিকাকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্থলভাগ ছিল মাত্র একটি।যাকে বলা হয় প্যানজিয়া।প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই স্থলভাগে রাজত্ব করত অতিকায় ডাইনোসর।একসময় সেটি ভেঙে যায়, সৃষ্টি হয় লরেশিয়া ও গন্ডোয়ানাল্যান্ড নামক দুটি মহাদেশ।গন্ডোয়ানাল্যান্ডের অংশ ছিল অ্যান্টার্কটিকা।সঙ্গে আরো ছিল দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত।পরবর্তী সময়ে ভারত ভেঙে গিয়ে ভেসে আসে পৃথিবীর অন্য পাশে, ধাক্কা খায় ইউরেশিয়ার সঙ্গে; জন্ম হয় হিমালয়ের। সে অবশ্য অন্য গল্প। এবারের আলোচনার বিষয় অ্যান্টার্কটিকা। দক্ষিণ মহাসাগর দিয়ে ঘেরা এ মহাদেশে লুকিয়ে আছে কত শত অজানা রহস্য, যার সন্ধানে ছুটে গেছেন রবার্ট ফ্যালকন স্কট, রোয়াল্ড আমুন্ডসেনের মতো প্রবাদপ্রতিম অভিযাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের শত শত বিজ্ঞানী।

(https://electromart.com.bd)

নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত থেকে শুরু করে আগ্নেয়গিরি–অ্যান্টার্কটিকার চারদিক ঢেকে রেখেছে শুভ্র বরফের চাদর।তার ভেতর উঁকি দিচ্ছে কচি পাতা, ফুল।শুষ্ক শীতের পর যে দৃশ্য বসন্তের আগমন মনে করিয়ে দেয়।অথচ এ অঞ্চলের ৯৮ ভাগ অংশই ঢাকা রয়েছে প্রায় ১ দশমিক ৯ কিলোমিটার পুরু বরফে।দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তাই মাইনাস ১০ ডিগ্রি থেকে মাইনাস ৬৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর সেখানে সূর্যের দেখা মেলা ভার। গোধূলির মতো সামান্য আলো ছড়ায় কেবল মে, জুন ও জুলাইয়ে।ফলে ভয়াবহ ঠাণ্ডার সঙ্গে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী লড়াই করতে পারে তারাই শুধু অ্যান্টার্কটিকায় টিকে থাকে।এর মধ্যে যেমন রয়েছে কিলার বা খুনে তিমি, এম্পেরর পেঙ্গুইন, সিল মাছ, কুমেরু চিংড়ি, কৃমি জাতীয় প্রাণী, বিভিন্ন ধরনের শৈবাল ও মাইক্রোঅর্গানিজম এবং সহস্রাধিক প্রজাতির ছত্রাক।

তীব্র শীতল এ অঞ্চলে এত দ্রুত কখনো কোনো উদ্ভিদের বাড়বাড়ন্ত ছিল না।এখন কেবল বৃদ্ধিই নয়, চরম শীতল আবহাওয়ায় ফুলও ফুটতে শুরু করেছে। অ্যান্টার্কটিকায় ফুল ফুটেছে–খবরটি আনন্দের মনে হলেও বাস্তবে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞানীদের মাঝে। কেননা এ ঘটনা প্রমাণ করছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের কবলে পড়েছে বরফরাজ্য।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, অ্যান্টার্কটিকার তাপমাত্রা সারা বছরই হিমাঙ্কের অনেক নিচে থাকায় সেখানে মস ও লিচেন জাতীয় শৈবালের জন্ম হয়। মূলত এরাই কুমেরু অঞ্চলের পুরনো বাসিন্দা। কিন্তু এবার নতুন ধরনের উদ্ভিদের দেখা মিলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে সেখানে নতুন ধরনের উদ্ভিদের জন্ম হচ্ছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।এতে কোপ পড়তে পারে সেখানকার মস ও লিচেনের বৃদ্ধিতে।ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে আন্টার্কটিকার বাস্তুতন্ত্র।মাটির চরিত্র বদলে যেতে পারে এমন আশঙ্কাও রয়েছে।

অজানা অ্যান্টার্কটিকায় গবেষক ও অভিযাত্রীদের ভিড় বাড়ছে ক্রমবর্ধমান। তাই মানুষের পায়ে পায়ে হিমশীতল মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে একাধিক উদ্ভিদের বীজ।প্রবল ঠাণ্ডায় সেগুলো এতদিন অঙ্কুরিত হতে পারেনি। কিন্তু দূষণের কারণে সেখানকার হিমবাহ-হিমশৈলগুলো স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েক গুণ দ্রুত হারে গলতে শুরু করেছে। তাই উদ্ভিদগুলো জন্ম নিতে পারছে।ফুল ফুটছে।আর এ ফুল ফোটা কি তবে অ্যান্টার্কটিকার বাস্তুতন্ত্র বদলে যাওয়ার ইঙ্গিত?

খুব একটা দূর অতীত নয়, মাত্র সোয়া লাখ বছর আগেকার কথা।গলতে শুরু করে অ্যান্টার্কটিকার বরফের বিশাল বিশাল খণ্ড।৩০ ফুটেরও বেশি ওঠে এসেছিল সবক'টি মহাসাগরের পানির স্তর। ভূপৃষ্ঠের প্রায় পুরোটাই চলে গিয়েছিল পানির তলায়।ঠিক তেমনটাই হয়তো ঘটতে চলেছে আবার। পার্থক্য কেবল একটাই, আগেরবার বরফ গলে যাওয়ার পেছনে মানবসভ্যতার কোনো হাত ছিল না।যেটা ছিল একেবারেই প্রাকৃতিক ঘটনা।আর এবার ঘটতে চলেছে আমাদের জন্যই।উষ্ণায়নের কারণে। আর এভাবে চলতে থাকলে পাঁচ থেকে সাত শতকের মধ্যেই পৃথিবীকে ডুবিয়ে দেয়ার মতো মহাপ্লাবনের আশঙ্কা অন্তত ৭০ শতাংশ। ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির ক্লাইমেট সায়েন্স বিভাগের একটি গবেষণায় মিলেছে ভয়াবহ সেই অশনিসংকেত।

(https://electromart.com.bd)

এদিকে ওজোন স্তরের ফাটল ক্রমেই বাড়ছে। নাসা জানাচ্ছে, অ্যান্টার্কটিকার বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোনের স্তরে ওই ফাটল ধরেছে অনেক দিনই। প্রতিদিন সেই ফাটল বাড়ছে রীতিমতো রেকর্ড হারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের ২৫ কিলোমিটার উঁচুতে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন স্তরের অবস্থান। সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি থেকে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখে সেই বলয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কারণে ক্রমে বাড়ছে উষ্ণায়ন। কয়েক দশক ধরে বাতাসে বেড়েছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি), ব্রোমিন, ক্লোরিন। ফলে বড় হচ্ছে ওজোন স্তরের ছিদ্র, যার প্রভাব পড়েছে জীবজগতে।()

বছর তিনেক আগে উত্তপ্ত হতে হতে কুমেরুর একটি অংশে পারদ চড়েছিল ১৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। জলবায়ুর এ পরিবর্তনের ফলে চরম বিলুপ্তির ঝুঁকিতে পড়েছে অ্যান্টার্কটিকার এম্পেরর প্রজাতির পেঙ্গুইন। এখন পর্যন্ত এ বিপর্যয়ে প্রায় ১০ হাজার পেঙ্গুইনের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে চলতি শতকের শেষ নাগাদ শতকরা ৯০ শতাংশেরও বেশি পেঙ্গুইনের কলোনি বা বসতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

'দ্য ক্রায়োস্ফিয়ার' জার্নালে ২০২১ সালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নব্বইয়ের দশক থেকে বিশ্বের মোট সামুদ্রিক বরফ, বরফ খণ্ড ও হিমবাহের মধ্যে প্রায় ২৮ ট্রিলিয়ন টন গলে গেছে। তিন দশক আগে যে হারে বরফ গলত, বর্তমানে তা ৫৭ শতাংশ দ্রুত হারে গলছে। নাসা গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জের এক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, অ্যান্টার্কটিকায় প্রতি বছর গড়ে ১৫০ বিলিয়ন টন বরফ গলছে এবং গ্রিনল্যান্ডে গলছে ২৭০ বিলিয়ন টন হারে। কুমেরু ও সুমেরুর এ বরফ গলা পানি বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৩৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ অবদান রাখছে।()

জার্মানওয়াচ প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১ প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম; যদিও গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে আমাদের ভূমিকা অতিনগণ্য। মূলত শিল্পোন্নত এবং বড় বড় উন্নয়নশীল দেশের কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ছে। কাজেই বিশ্বের বড় বড় দেশের কার্বন নিঃসরণ হ্রাসই এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

'প্রজেকশন অব সি লেভেল রাইজ অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট অব ইটস সেক্টরাল (এগ্রিকালচার, ওয়াটার অ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার) ইমপ্যাক্টস' শীর্ষক একটি গবেষণা করেছে সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপণের লক্ষ্যে প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করেছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড। গবেষণায় প্রাপ্ত ফল থেকে জানা যায়, তিন দশ ধরে দেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রতি বছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার প্রায় ৩ দশমিক ৮ থেকে ৫ দশমিক ৮ মিলিমিটার। আর এভাবে চলতে থাকলে চলতি শতকের শেষে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১২ দশমিক ৩৪ থেকে ১৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ সমুদ্রে ডুবে যাবে। ধান উৎপাদন কমবে ৫ দশমিক ৮ থেকে ৯ দশমিক ১ শতাংশ পর্যন্ত।

(https://electromart.com.bd)

অ্যান্টার্কটিকার জীববৈচিত্র্য ও দৃশ্যপটের দ্রুত বদল পুরো পৃথিবীর জন্যই যে অশনিসংকেত, সে বিষয়ে বারবারই সতর্ক করে যাচ্ছেন পরিবেশবাদী ও বিজ্ঞানীরা। তবে এখনো আশা শেষ হয়ে যায়নি, কার্বন নিঃসরণ যদি কমিয়ে আনতে পারি প্রকৃতি ফিরে পাবে তার আপন ঠিকানা।আর যদি ব্যর্থ হই, তাহলে পৃথিবীর অনেক বাসিন্দাকেই বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাব আমরা।

ওবায়দুল্লাহ সনি: সাংবাদিক

অপেক্ষা করুন

(https://electromart.com.bd)